নবীনচন্দ্র দে

গল্পকার কিন্নর রায়

বড়ো পত্রিকার মোহময় প্রলোভনকে অস্বীকার করে কেবলমাত্র ছোটোপত্রিকা তথা ছোটো প্রকাশনীর হাত ধরে সত্তর দশক থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের জগতে নিজের অভিজ্ঞতার ডালিতে বৈচিত্রময় বিষয়ভাবনার সম্ভার নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছেন যে মানুষটি, তিনি হলেন স্বয়ং কিন্নর রায় (১৯৫৩)। আটত্রিশটি উপন্যাস ও ষোলোটি গল্পসংকলনে শতাধিক ছোটোগল্পে তিনি মানুষের জীবন ও তার সমাজের এক গভীর পর্যবেক্ষণের বিশ্লেষণী দিকের সুনিপুণ ছবি এঁকে চলেছেন। নিজের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও লেখনশৈলীর বিবর্তিত পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি যা লিখে চলেছেন তা পড়তে পড়তে পাঠকের ক্লান্তি এলেও বিষয়ের অভিনবত্বে তথা শব্দের রীতি বৈপরীত্যে সচেতন পাঠক মাত্রই সজাগ হয়ে থাকেন গল্পের পরিণামের অপেক্ষায়। ছোটোগল্পের পরিণতিতে মোপাসাঁ যেমন দেখিয়েছেন চাবুক মারা আকস্মিক পরিণাম, চেখভের লেখায় যেমন এসেছে অনিবার্য যুক্তিযুক্ত পরিণামের মেলবন্ধন, সেদিক থেকে কিন্নর রায়ের গল্পের চরিত্ররা সেই পথের পথিক না হয়েও চলেছে নিজেরা নিজেদেরই চলবার ছন্দে এবং এই চলবার ছন্দেই এসেছে তাদের জীবনে বাস্তবোচিত চমকহীন সমাপ্তি। যুগান্তরের পাতায় 'আউট' গল্পের মধ্য দিয়ে যার সূত্রপাত। বিবর্তনের ধারায় বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মাধ্যমে তা আজও চলেছে স্বমহিমায় এগিয়ে।

২০১৯ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায় কিন্নর রায়ের প্রথম প্রকাশিত গল্পসংকলন রথযাত্রা (১৯৮৭)। তারপর একে একে প্রকাশিত হয়েছে— অন্যধারার গল্প (১৯৯২), ধর্মসংকট (১৯৯৩), এন্টারটেইনমেন্ট আওয়ার (১৯৯৬), কুরোশাওয়া ভিজে যাচ্ছে (১৯৯৬), কিন্নর রায়ের ছোটোগল্প (১৯৯৭), অরূপ কথা (১৯৯৮), জ্যোৎস্নায় শঙ্খচিল (১৯৯৯), হুজুরের ঘোড়া (?), বিদ্যাধরীর ঘুঙুর (?), সরস্বতী (?), তুলসিচরিত মানস (?), চন্দ্রাভিসার (?), দশটি গল্প (?), স্কাইপে কৃষ্ণ (?), গল্পস্বল্প (২০১৯)। দীর্ঘ এই বত্রিশ বছরের মধ্যে প্রকাশিত তাঁর গল্পসংকলনের পরিমাণ যেমন বেড়েছে তেমনই বিষয়ের নিরিখে তা হয়েছে বিবর্তিত। কখনো সেখানে এসেছে নকশালপন্থীদের জীবন, মানুষের ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধ, সাম্প্রদায়িক বিভাজনের জটিল রূপ,

তেমনই এসেছে অতি সাম্প্রতিক ঘটনা সমূহ— পরিবেশ দূষণের বহুমাত্রিক দিক, নেশার রঙিন জগতে হারিয়ে যাওয়া বিপন্ন মানুষের আর্তনাদ ইত্যাদি নানান বিষয়। যা তাঁকে সজাগ, সচেতন, সমাজমনস্ক, অনুসন্ধানী, পরিশ্রমী কথাসাহিত্যিকের মর্যাদা দিয়ে থাকে।

নিছকই বিলাসিতা বা যশ লাভের একান্ত ইছাতেই অনেক কথাসাহিত্যিকই শুরু করেন তাঁদের লেখালেখি। সেদিক থেকে কিন্নর রায় সম্পূর্ণ ভিন্ন এক নির্জন দ্বীপের বাসিন্দা। 'কেবল যশের জন্য লিখিও না'— বঙ্কিমের এই সতর্ক বানীকে শিরোধার্য করে তিনি লিখে চলেছেন প্রতিনিয়ত। গল্প উপন্যাসের সাথে সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ, রাজনৈতিক প্রবন্ধ, তুলনামূলক রচনা সমেত সমস্ত কিছুই। অর্থ লাভের একান্ত বাসনা না থাকলেও তাঁর এই লেখালেখির কারণ অন্বেষণ করতে গিয়ে মেলে এক ভিন্ন উত্তর, কেন লিখতে এলাম, নিজের সামনে এই জিজ্ঞাসা ছুড়ে দিলে হয়তো উত্তর পাই— যন্ত্রণার এই ভারবহন ও সেই বেদনাকে বার করে দিয়ে আশ্চর্য এক মুক্তির আনন্দ, সব মিলিয়ে আমার লেখালেখি।[১] দেওয়া-নেওয়ার এই বৈশ্য সামাজিকতার একাকীত্বে তাই তাঁর লেখাতে তিনি বাহন করে নিয়েছেন নিজের জীবনাভিজ্ঞতা তথা কল্পনা ও বাস্তবের মেলবন্ধনে মুক্তির আস্বাদকে। তার ওপরই ভর করে চলেছে তাঁর লেখার ক্রমবিবর্তনের ধারা। সচেতন পাঠক মাত্রই তা পারে উপলব্ধি করতে।

সত্তর দশকের কথা বলতেই প্রথমে ভেসে ওঠে নকশালবাড়িকে কেন্দ্র করে বাতাসে বারুদের গন্ধ, রাস্তায় রক্তের ছাপ, গ্রাম দিয়ে শহরকে ঘিরে ফেলার তীব্র মানসিকতা। আর এই সময়ের গল্পকারদের লেখায় তার প্রতিফলন ঘটেছে বারবার। নবারুণ ভট্টাচার্য, অনিল ঘড়াই, নলিনী বেড়া, ভগীরথ মিশ্র, অমর মিত্র, প্রমুখর মতো কিন্নর রায়ের গল্প সাহিত্যেও ধরা পড়েছে সেই সময়ের প্রতিচ্ছবি। সকলের মতো প্রত্যক্ষ সেই সময়ের রক্তমাখা মাটির স্বাদ কিন্নর রায় নিয়ে আসেননি তাঁর গল্পে। বরং ব্যর্থ সংগ্রামের অংশীদার হিসেবে নকশাল জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ের গল্প শুনিয়েছেন তিনি। সাতাত্তরে জেল থেকে ছাড়া পাবার পর, মা-ই তো আমায় জেল থেকে বেরোনোর পর বিভিন্ন জন আমি ঠিক কী করছি জানতে চাইলে বলতেন, 'আমার বিধবা মেয়ে'। এই কথাটা শুনে একটু খারাপ তো লাগতই।... এখন বুঝি তিনি হয়তো আমার বিবেককে, কর্তব্যবোধকে খানিকটা হলেও জাগ্রত করতে চেয়েছেন। নিজের কষ্ট, না-পাওয়া অভাবের কাঁটাটি উপড়ে তুলে আনতে চেয়েছেন ক্ষতের গভীর থেকে।[২] জীবনের এই তীক্ষ্ণ অভিজ্ঞতার কথা এসেছে ১৯৮৪-তে 'বিভাব' পত্রিকায়

প্রকাশিত তাঁর 'চিলেকোঠা' গল্পটিতে। যেখানে সত্তরের ব্যর্থ সৈনিক বছর পঁয়ত্রিশের মিলন চোদ্দো বছর পর জেল থেকে ফিরেছে তার বালির বাড়িতে। কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শের পথে চলতে গিয়ে বারো বছর আগে দেখা হয় মিলনের সাথে গীতির। দু-বছর পর হয় তাদের মেয়ে সৃষ্টি। কিন্তু জেল থেকে বেড়িয়ে গীতির সাথে কুদঘাটের বাড়িতে থাকতে গিয়ে মিলন অনুভব করে তাদের মধ্যেকার ফারাক। শুধু সময়ের ও অর্থের নয়, মানসিকতা ও কমিউনিস্ট আদর্শেরও। মিলনের একার রোজগারে নিজের পেট ভরাবার যোগ্যতা না থাকায় তাকে ফিরে আসতে হয় তার মা, বড়দা, বউদি, দুই ভাইপো এবং ছোটোভাই সায়ন ও বোন দীপ্তির মফস্সলের বাড়িতে। যেখানে তার প্রাপ্য হিসাবে জোটে চিলেকোঠার একটি ঘর। যে চিলেকোঠা তার ফিকে হয়ে আসা ছেলেবেলার শেষ স্মৃতিচিহ্ন। তার শেষতম দুর্গ। কিন্তু তার এই দুর্গের প্রাচীরে যে চির ধরেছে সেকথা মিলন বোঝে ছোটোবোন দীপ্তির কথাতে, পুরনো কত নকশালরা তো এখন ভালো ভালো চাকরি করছে। কেউ বা গ্রামে গিয়ে দারুণ সব প্রজেক্ট করছে। অনেকে তো লেখকই হয়ে গেল। মন্ত্রী-টন্ত্রীরাও তো এখন ওদের তোয়াজ করে।[৩] নিজের অবসাদ, না পারার বিষণ্ণতা নিয়ে মিলন আজ পরিণত হয় এই বাড়ির জীবন্ত আস্তাকুঁড়ে। যাকে ঝেড়ে ফেলতে চায় তার সমাজ তার পরিবার। তাই বোন প্রীতির বাচ্চা হবার অজুহাতে মিলনকে তার মা বলে, ছোটো খাটিয়া নিয়ে তুই নয় উঠোনে শুবি, নয়তো ছাদে। একলা মানুষের আবার জায়গার অভাব।[৪] কেড়ে নেওয়া হয় তার আশ্রয়ের শেষ দুর্গটিকে। দিনবদলের স্বপ্ন নিয়ে বড়ো হওয়া মিলন তাই কুয়াশা মাখা পথ ধরে পা বারায় তার অনন্ত যাত্রার পথে। একজন নকশালের পরবর্তী জীবনের করুণ পরিণতিই লেখক আসলে দেখিয়েছেন এই গল্পে।

এই একই জীবনবোধের ছবি ধরা পড়েছে তার 'স্থিতাবস্থা', 'ডিসিডেন্ট'-এর মতো গল্পগুলোতে। এদিক থেকে একটু আলাদা 'নিখোঁজ' (১৪০২, শারদীয় রক্তকরবী) গল্পটি। যেখানে লেখক সত্তরের সময়ে দাঁড়িয়ে প্রশাসনের খাতা থেকে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া— মানবতা, মানবাধিকার তথা গণতন্ত্রের খোঁজ করেছেন। তৎকালীন প্রশাসনের কাছে যা ছিল সত্যিকারের লুপ্ত বস্তু। কালের নিয়মে বদলেছে সময় আর তাকে কেন্দ্র করে বদল ঘটেছে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের। বদল ঘটেছে মানুষের মানসিকতারও। আর সেই বদলে যাওয়া সময়ের মানসিকতাকে লেখক তুলে এনেছেন তাঁর ২০১৭ সালে প্রকাশিত 'বরকা সোরেনের বন্দুক' গল্পে। যেখানে লেখক বলতে চেয়েছেন আজকের

মানুষের কাছে নকশালদের সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের থেকেও বেশি মূল্যবান একজন নকশালকে কেন্দ্র করে থাকা নানা উপাদানের বাণিজ্যিক টি.আর.পি। গল্পে দেখাযায় সাতচল্লিশ বছরের রতন সান্যাল তার ওকালতির অবসরে নিজের সাতাশতলার ফ্লাটের ঘরে বসে নকশাল আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর উপলক্ষে তৈরি করেছে এক গবেষণাধর্মী নিবন্ধ। সেই সুত্রেই পুলিশ ফাইল ঘেঁটে সে বের করেছে দারোগা সোরেনের নম্বর। কেননা তার বাবা বরকা সোরেন যে বন্দুক নিয়ে গ্রাম কাঁপিয়ে বেড়াত ধরা পড়বার সময় তা ছিল না তার সাথে। তাই নিজের গবেষণা পুর্ণ করা ও টিভি চ্যানেলে নিয়মিত বলাবলির টকশোয়ে ঐতিহাসিক দলিল রূপে বরকা সোরেনের থেকে বেশি জরুরি তার বন্দুক রতন সান্যালের কাছে। তাই দারোগা সোরেনকে টাকার লোভ দেখায় রতন, লোকটা টাকার কথা বলে। একদম নগদ— হাতে দিয়ে যাবে একেবারে। লোকটা তাকে লোভ দেখায়।[৫] আসলে রতনের মতন মানুষেরা উপলব্ধি করতে পারে না একটা দোনলা বন্দুক নিয়ে একজন নকশালের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মানসিক যন্ত্রণা ও অবসাদকে। তাই যখন সে ঘুমের গভীরে দেখে বরকা সোরেন তার সেই বন্দুক দিয়ে তার মাথা ও বুক ক্রমাগত দুরমুশ করছে তখন, ঘন শীতের রাতে সাতাশতলার ওপর রতনকিশোর সান্যালের গলা আটকানো জল তৃষ্ণা তীব্র থেকে আরও অধিক তীব্রতর- জোরদার হতে থাকে। আরও আরও অনেক বেশি জোরদার।[৬] এইভাবে কিন্নর রায় তাঁর গল্পে সত্তরের সময় ও তার সাথে জড়িয়ে থাকা মানুষের অভিব্যক্তির ছবি এঁকেছেন।

চলতে চলতে নদী বাঁক নেয়, পরিবর্তন ঘটে তার ও তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা পরিবেশের। সময়ের সাথে সাথে কিন্নর রায়ের লেখাতেও এসেছে সেই বাঁক। সাংবাদিকতা করবার সুত্রধরে তিনি অনেক ক্ষেত্রে যেমন বাংলা তেমনই বাংলার বাইরের মানুষের জীবনযাত্রার সাথে গভীর ভাবে হয়েছেন একাত্ম। আর প্রত্যক্ষভাবে তার প্রভাব পড়েছে তাঁর লেখাতে। ফলে এসেছে গল্পের প্লটের নানান বৈচিত্র্য,... 'পেশাদার বিপ্লবী' হিসেবে জনগণের সঙ্গে একাত্ম হতে গিয়ে বিহারের ভূমি, মানুষ আমায় দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন 'রথযাত্রা', 'ভোজ'।... 'পরচারক' গল্পটি পাই বিহারের সাসারামে বাবু জগজীবন রামের নির্বাচনী ক্ষেত্রে ইলেকশন রিপোর্ট করতে গিয়ে।[৭] এইসব গল্পে কেবলমাত্র ভারতীয় ভূখণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন গন্ধ আসেনি, তারসাথে এসেছে ধর্মের নামে, জাতের নামে মানুষের মধ্যেকার বিভেদ। আর এই সকল মানুষগুলোকেই কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে উচ্চবর্ণের মানুষের রাজনৈতিক মসনদ টিকিয়ে

রাখবার কাজে তার জীবন্ত ছবি। উদাহরণ হিসেবে ১৯৮৫ সালে 'প্রমা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'পরচারক' গল্পের কথা বলা যেতে পারে। ১৯৫২ সাল থেকে সাসারামের একটি হরিজন এলায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে আসছে বাবাজি। যদিও এটা তার জেলা নয়। আরাতে তার বিশাল আমেরিকান কায়দার বাড়ি, যার চারপাশে হরিজনদের নোংরা ঝোপড়ি। সমাজ বৈষম্যের ইঙ্গিতদায়ী এই অবস্থান। সামনে ভোটের নির্বাচন। আর এই ভোট উৎসবের পরচারকেরা হল— বেলহারের মঙ্গিরাম, শিউপুরের লল্লুপ্রসাদ, কাদিরগঞ্জের সজ্জনরাম এমন আরও কিছু হরিজন মানুষ। এদের বিশ্বাস বাবাজি একজন স্বামীজি। তিনি ভজন গান লেখেন। সুর দেন। কিন্তু এরা ভাবতেও পারে না তারা ভারতবর্ষের এই বিশাল রাজনৈতিক দাবার ছকে বোড়ে মাত্র।[৮] ঝান্ডা লাগানো, ব্যানার ঝোলানো, গোবরকে দেওয়ালে লেপে তার ওপর বাবাজির ফিল্মি কায়দার পোস্টার লাগানো— এইসব নিয়ে হরিজনদের মধ্যে চলতে থাকে বাবাজির প্রচার অভিযান। তাদের কাছে এই সকল কাজ কোন পবিত্র উৎসবের সামিল। কেননা ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ও তারা এই একটি দিনেই সমান সুযোগের ও সমান মর্যাদার অধিকারী। অচিরেই ভুল ভাঙে হরিজনদের। দিনকাল আর 'হাওয়ার' কথা ভেবে রাজাসাহেব বাবাজি এই পবিত্র কর্মটি সমাধা করিয়েছে।[৯] তাদের বদলে নিজেই তাদের ভোট দিয়ে দিয়েছে। আসলে ভারতের গণতন্ত্রের পর্দা দেওয়া জীর্ণ চেহারাই তো এটা। যেখানে ভোট হয় না হরিজনদের জীবনের অন্ধকার দূর করতে, হয়ে থাকে ব্যক্তি স্বার্থের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে। হরিজনদের কথায় তাই শোনা যায়, কেন দেব বাবাজিকে ভোট? কী করেছেন তিনি আমাদের জন্য এতদিন? আমরা তো যে অন্ধকারেই।[১০]

একথা ঠিক যে কিন্নর রায়ের লেখাতে একটু বেশি সাংবাদিকতার ঝোঁক থাকলেও ঘটিত বাস্তবকে শিল্পের বাস্তবে পরিণত করতে তিনি সমর্থ হয়েছেন। ধর্মীয় বিশ্বাস, মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতার অন্তর্দ্বন্দ্বকে এক চালচিত্রে ধীর লয়ে, অনুপুঙ্খ চিত্রনে তুলে ধরেছেন তিনি তাঁর গল্পে। আশির দশকের শেষ বা নব্বইয়ের শুরুতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মানচিত্র যে ধর্মান্ধতার গোঁড়ামি নিয়ে মন্দির-মসজিদ ধ্বংসের লড়াই শুরু হয়, তা গভীর ভাবে ব্যাথিত করে লেখকের মানসলোককে— ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিস্টরা অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ভেঙে দেয়। এই অতীব অন্যায় ঘটনাটিতে অসম্ভব আলোড়িত হই।[১১] মনের এই আলোড়নের প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর বেশকিছু গল্পে, যেমন— উপমহাদেশ (প্রতিক্ষণ, ১৯৯০), দুদ-পান্তার স্মৃতি (সংবাদ

রাখবার কাজে তার জীবন্ত ছবি। উদাহরণ হিসেবে ১৯৮৫ সালে 'প্রমা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'পরচারক' গল্পের কথা বলা যেতে পারে। ১৯৫২ সাল থেকে সাসারামের একটি হরিজন এলায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে আসছে বাবাজি। যদিও এটা তার জেলা নয়। আরাতে তার বিশাল আমেরিকান কায়দার বাড়ি, যার চারপাশে হরিজনদের নোংরা ঝোপড়ি। সমাজ বৈষম্যের ইঙ্গিতদায়ী এই অবস্থান। সামনে ভোটের নির্বাচন। আর এই ভোট উৎসবের পরচারকেরা হল— বেলহারের মঙ্গিরাম, শিউপুরের লল্লুপ্রসাদ, কাদিরগঞ্জের সজ্জনরাম এমন আরও কিছু হরিজন মানুষ। এদের বিশ্বাস বাবাজি একজন স্বামীজি। তিনি ভজন গান লেখেন। সুর দেন। কিন্তু এরা ভাবতেও পারে না তারা ভারতবর্ষের এই বিশাল রাজনৈতিক দাবার ছকে বোড়ে মাত্র।[৮] ঝান্ডা লাগানো, ব্যানার ঝোলানো, গোবরকে দেওয়ালে লেপে তার ওপর বাবাজির ফিল্মি কায়দার পোস্টার লাগানো— এইসব নিয়ে হরিজনদের মধ্যে চলতে থাকে বাবাজির প্রচার অভিযান। তাদের কাছে এই সকল কাজ কোন পবিত্র উৎসবের সামিল। কেননা ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ও তারা এই একটি দিনেই সমান সুযোগের ও সমান মর্যাদার অধিকারী। অচিরেই ভুল ভাঙে হরিজনদের। দিনকাল আর 'হাওয়ার' কথা ভেবে রাজাসাহেব বাবাজি এই পবিত্র কর্মটি সমাধা করিয়েছে।[৯] তাদের বদলে নিজেই তাদের ভোট দিয়ে দিয়েছে। আসলে ভারতের গণতন্ত্রের পর্দা দেওয়া জীর্ণ চেহারাই তো এটা। যেখানে ভোট হয় না হরিজনদের জীবনের অন্ধকার দূর করতে, হয়ে থাকে ব্যক্তি স্বার্থের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে। হরিজনদের কথায় তাই শোনা যায়, কেন দেব বাবাজিকে ভোট? কী করেছেন তিনি আমাদের জন্য এতদিন? আমরা তো যে অন্ধকারেই।[১০]

একথা ঠিক যে কিন্নর রায়ের লেখাতে একটু বেশি সাংবাদিকতার ঝোঁক থাকলেও ঘটিত বাস্তবকে শিল্পের বাস্তবে পরিণত করতে তিনি সমর্থ হয়েছেন। ধর্মীয় বিশ্বাস, মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতার অন্তর্দ্বন্দ্বকে এক চালচিত্রে ধীর লয়ে, অনুপুঙ্খ চিত্রনে তুলে ধরেছেন তিনি তাঁর গল্পে। আশির দশকের শেষ বা নব্বইয়ের শুরুতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মানচিত্র যে ধর্মান্ধতার গোঁড়ামি নিয়ে মন্দির-মসজিদ ধ্বংসের লড়াই শুরু হয়, তা গভীর ভাবে ব্যাথিত করে লেখকের মানসলোককে— ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর হিন্দুত্ববাদী ফ্যাসিস্টরা অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ভেঙে দেয়। এই অতীব অন্যায় ঘটনাটিতে অসম্ভব আলোড়িত হই।[১১] মনের এই আলোড়নের প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর বেশকিছু গল্পে, যেমন— উপমহাদেশ (প্রতিক্ষণ, ১৯৯০), দুদ-পান্তার স্মৃতি (সংবাদ

প্রতিদিন, ১৯৯৩), ধর্মসংকট (প্রমা, ১৯৯২)। এইসকল গল্পগুলোতে লেখক খোঁজার চেষ্টা করেছেন ধর্মের নামে মানুষের এই বর্বরতার প্রকৃতস্বরূপ। ১৯৯৫-তে 'দিবারাত্রির কাব্য'তে প্রকাশিত 'তুলসিচরিত মানস' গল্পে তিনি সেই খোঁজের কথাই বলেছেন। কল্পনা ও বাস্তবের সংমিশ্রণ ঘটেছে তাঁর এই গল্পে। গল্পে প্রথমে এসেছে ইতিহাসের সুত্রধরে রামচরিত মানসের স্রষ্টা তুলসিদাসের ইতিহাস। ১৫২৩ ইসাই সালে জন্মগ্রহণ করেন তুলসিদাস। ৫২ বছর বয়সকালে অযোধ্যাতে তিনি তাঁর কাব্যের রচনা শুরু করেন এবং শেষ করেন কাশীর গঙ্গাতীরে। কিন্তু এই গল্প সেই তুলসিদাসের নয়। এগল্প আজকের কিনসিন জুটমিলের তাঁত বিভাগের বদলিবালা কর্মচারী তুলসিদাস যাদবের। মিল বন্ধ থাকায় যাকে কিনা এখন দিনযাপনের জন্য বেচতে হয় খৈনি। আর তার থাকবার জন্য আছে রেল লাইনের পাশের পরিত্যক্ত অস্থায়ী ঘর, প্রায় শুনি, লাইনের এই ঘর থেকে আমাদের তুলে দেবে। এখানে বড়ো বাজার হবে। মাথা উঁচু ফেলাট বাড়ি। রাইস আদমি থাকবে। লেকিন হমলোগ যায়েগা কাঁহা?[১২] উন্নয়নের নামে ফ্লাট বানানো বাজার বানানো যাদের অভিসন্ধি, তারা কিন্তু মানুষের প্রকৃত উন্নয়নের কথা ভেবে কখনো চালু করার চেষ্টা করে না বন্ধ হয়ে থাকা মিলের দরজা। বরঞ্চ রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে গড়ে তুলতে চায় রামমন্দির। তবুও তারা দেখার চেষ্টা করে না কোথায় রামের প্রকৃত অবস্থান? রাতে স্বপ্নে খৈনীবালা এই প্রশ্ন করে সন্তকবি তুলসিদাসকে,— হম লোগ লাইন সে চলে যায়েঙ্গে কেয়া তুলসিদাসজি—... আখির কেয়া রাম কা মন্দির হোগা— অযোধ্যা মে[১৩] উত্তরে তুলসিদাস বলেন— রামকো আপনা মন মে রাখখো— উনকো কই জনমভূমি হ্যায় নহি। উনকো জনম মনমে। মেরা মন, তুমহারা মন— যো সমঝো[১৪]

আবার এই রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় সংকটের জাঁতাকলে পিষে সাধারণ মানুষ যে কীভাবে বিভ্রান্ত হয়েছে ও নিজের জীবনকে বিনা অপরাধে হারিয়েছে, সেই দিকেরই উল্লেখ রয়েছে ১৯৯৩ সালে শারদীয় প্রতিক্ষণে প্রকাশিত 'বোকাবুড়ো' গল্পতে। ইলাহাবাদের পুরানা কাটরার বাসিন্দা বি.এ.এল.এল.বি জয়শঙ্কর সাকসেনা। বিয়াল্লিশের ভারতছাড় আন্দোলনে জাতিভেদের কথা ভুলে দেশের জন্য টানা দু-বছর জেল খাটেন তিনি। সেই দেশাত্ববোধ সঞ্চারিত হয়েছে তার সন্তানদের মধ্যেও। তার বড়ো ছেলে রাকেশ সাকসেনা নেভি অফিসার। কিন্তু নিজেকে জাতীয়তাবাদের আদর্শে গড়লেও সেই ভাবনা তিনি সঞ্চারিত করতে পারেননি তার ছেলের ও সমাজের মনে। তাই দেখা যায় নেভি থেকে সাতদিনের

ছুটিতে বাড়ি আসা রাকেশ জড়িয়ে পড়ে জাতীয়তাবাদের নামে দেশের সংস্কৃতি হননের লীলা খেলায়, রাকেশ কারসেবক হয়ে অযোধ্যা যাবে। বাবরি মসজিদ ভাঙা হবে।[১৫] নিজের পচিশ বছরেরে ঔদ্ধত্ব যুবককে বৃদ্ধ জয়শঙ্কর বোঝাতে পারে না— তার এই অন্ধতা, অজ্ঞানতা, হিন্দুত্ববাদ আসলে আদিম পৈশাচিক বর্বরতা। যা রামের নামে রাবণকে নয়, বরঞ্চ নিরিহ মানুষদেরই ঠেলে দিচ্ছে পাপের পথে, মৃত্যুর পথে।

হর হর মহাদেও, জয় বজরঙ্গবলীকি, জয় জয় শিরাম— আদিম রনহুঙ্কারে কেঁপে উঠেছিল অযোধ্যার আকাশ।... আছড়ে পড়েছিল পাঁচশ বছরের পুরনো দেওয়াল... রাকেশ লাথিতে লাথিতে পুরনো ইটের গাঁথনিতে ধুলো উড়িয়ে দিতে দিতে ভাবছিল— হামলোগ আজাদিকে লিয়ে লড় রয়ে হ্যা।[১৬] হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে ধর্মনিরপেক্ষের কাঠামো। নিজেকে বাবরি মসজিদ ধ্বংস, রাম জন্মভুমি উদ্ধারের জন্য ধন্য মনে করে রাকেশ। কিন্তু যে ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থেকে নিজেকে হিন্দু বলে উৎফুল্ল হচ্ছিল রাকেশ, সেই মুহূর্তেই সারা দেশ জ্বলে ওঠে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার আগুনে। বেঁচে থাকবার আর্তি ও অধিকার ছিনিয়ে নেবার আধুনিক সেকুলারিজমে মেতে ওঠে সারা দেশ সেই রাতে। নিজের ছেলের খবর না পেয়ে দুশ্চিন্তায় পথে নামে জয়শঙ্কর। কিন্তু উগ্রতা দেখে না জাত— তাই বিধর্মীর নামে গুলি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন জয়শঙ্কর— শালা বুড়বাক, বলতে বলতে দু-জোড়া স্পোর্টস শ্যু পরা পা কুয়াশার আড়ালে মুছে গেলে গোটা পৃথিবী তেমনই নিঃশব্দ হয়ে যায়।[১৭]

এইভাবে কিন্নর রায় তাঁর বিভিন্ন গল্পে নিয়ে এসেছেন সাম্প্রদায়িকতার আগুনে মোড়া সময়ের কিছু খণ্ড চিত্র।

সাম্প্রদায়িকতার পাশাপাশি পরিবেশ ভাবনার বিষয়টি তাঁর লেখায় এসেছে নানা ভাবে। ভারতীয় জীবনে প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষণের বিষয়টি অতি প্রাচীন। সকলকে রক্ষা করবার কথা আছে আমাদের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থগুলোতে। আর সেই পরিবেশের ভাবনাও এসেছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখকেদের লেখাতেও। 'বলাই' গল্পে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রকৃতি ভাবনাকে দেখিয়েছেন নিজের মতন করে। আবার বিভূতিভূষণ তাঁর আরন্যকের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে দিয়েছেন প্রকৃতির বিশুদ্ধতার গন্ধ। সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁদের পরবর্তী কথাসাহিত্যে সেই ধারার প্রবাহ লক্ষ্য করা অসম্ভব নয়। যদিও সত্তরে পরিবেশ নিয়ে ভারতে তেমন কোনো আলোড়ন চোখে পড়ে না, তবুও পশ্চিমে পরিবেশ নিয়ে জাগরুকতা লক্ষ্য করা গেছিল তখন থেকেই। আর একজন সমাজ সচেতন মানুষের পক্ষে

তাকে উপেক্ষা করা কখনই সম্ভব নয়। স্বপ্নময় চক্রবর্তী, ভগীরথ মিশ্র, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের লেখাতে তাই বারবার এসেছে পরিবেশ ও যন্ত্রায়নের কথা। কিন্নর রায় সেদিক থেকে ব্যতিক্রমী নন। প্রকৃতিকে জয় করবার নাম করে বড়ো বড়ো বাঁধ, ভারীশিল্প, বি-ই-শা-ল কলকারখানা তৈরি করে একদল মানুষ আসলে ধ্বংস করছে পরিবেশ, প্রাকৃতিক ভারসাম্য। নদী, হ্রদ শুকিয়ে গেছে ধীরে ধীরে। সাগর, আকাশ হয়ে উঠেছে বিষাক্ত। মহাকাশ ভরে গেছে স্যাটেলাইট বর্জ্যে।[১৮]— এই সমস্ত অনুষঙ্গের কথা নানা ভাবে এসেছে তাঁর বিভিন্ন উপ্যনাসে গল্পে। সচেতন শিল্পীর মতন তিনি তাকে গেঁথে দিয়েছেন তাঁর লেখার বুননের মধ্যে। উদাহরণ হিসাবে ১৪০৮ বঙ্গাঃ শারদীয় 'গল্পগুচ্ছে' প্রকাশিত তাঁর 'ইলিশ' গল্পে আসা পরিবেশ সচেতনতার কথা উল্লেখ করা যায়। যেখানে নদীর ওপর গড়ে ওঠা ভেড়ি ও তার ফলশ্রুতি নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি, ভেড়ির পর ভেড়ি তৈরি হয়েছে নদীর বুক বুজিয়ে। তৈরি হচ্ছে ইট ভাটা। ফলে নদীর বুক বুজে গিয়ে বন্যা— এই তো গত বছরই সারা বাংলা ভাসল বন্যায়। কী বিপুল ক্ষয়ক্ষতি। ইছামতীর খাত অনেকটাই বুজে গেছে,... একেবারে বুজে নষ্ট হয়ে গেল যমুনা, সুতি, নোয়াই।[১৯]

আবার ১৯৯৬-তে 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'শঙ্খবালা' গল্পে লেখক শুনিয়েছেন ফারাক্কা বাঁধের ফলে সৃষ্টি হওয়া দুই প্রতিবেশি দেশের মধ্যেকার জলসংকটের কথা— এপারে, ইন্ডিয়ার দিকে জল, স্রোতে ফুলে ফেঁপে ওঠা গঙ্গা। আর ওপারে শুকিয়ে, প্রায় মরে যাওয়া নদীর বুক। মাইলের পর মাইল ধু ধু বালি। কোথাও পানি নেই। হায় আল্লা, হায় পানি, বাংলাদেশের মানুষ তো এমনই বলে।... ফারাক্কা বাঁধ কেড়ে নেয় হকের পানি।[২০]

এছাড়া কিন্নর রায়ের ১৪০৩-এ 'প্রমা'-তে প্রকাশিত 'অনন্তের পাখি' গল্পে সচেতনভাবে তিনি প্লাস্টিক দূষণের দুষ্প্রভাবের ফলে নষ্ট হয়ে আসা পরিবেশের প্রতি জনগণকে সচেতন করতে চেয়েছেন, গোটা জলাভূমি ঢেকে আছে নানান রঙের পলিব্যাগে। আমাদের বাড়িতে ভাত খেতে আসা বাসা হারানো বকটি গম্ভীর মুখে বসে সেই জলের পাড়ে। আমরা কোথায় যাব পালমশাই? কোথায় যাব? আপনি বলুন— পলিব্যাগেরা চিৎকার করছিল। রোজ রোজ আপনি কত ব্যাগে মুড়ে জিনিস দেন খরিদ্দারদের। তারপর, তারপর তাদের খবর রাখেন?[২১]

এইভাবে লেখক তাঁর বিভিন্ন গল্পে পরিবেশের অনুষঙ্গ নিয়ে এসেছেন এবং তার পরিণামের দিকের প্রতি মানুষকে সচেতন করতে চেয়েছেন বারবার।

গল্পের উদ্দেশ্য কখনই নীতিজ্ঞান নয়। সমাজ জীবনের বাস্তব ঘটনাকে একজন শিল্পী মনের মাধুরী মিশিয়ে পরিবেষণ করে থাকেন পাঠকের দরবারে। যা পাঠকের নৈতিক মূল্যবোধকে বদলাতে না পারলেও তাকে এনে দাঁড় করিয়ে দেয় তার বিবেকের প্রতিবিম্বের কাছে। কিন্নর রায়ও তাঁর গল্পের মধ্য দিয়ে এই বিষয়টিকে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে নিয়ে এসেছেন। সিস্টেমের মধ্যেকার শোষণের কথা বলার পাশাপাশি, সেই শোষণে জর্জরিত মানুষের পরিণতির সংজ্ঞা বলার চেষ্টা করেছেন তিনি। তাঁর বালিজল, জলবালি (কালিকলম, ১৪২২), সিদ্ধকাম (আজকাল রবিবাসরীয়, ২০১৭), যমুনাবতী সরস্বতী (আজকাল রবিবাসর, ২০১৩)—এর মতো গল্পগুলো সেই প্রসঙ্গেরই ইঙ্গিতবাহী। এছাড়াও ২০১৩ সালে 'পূর্ব' পত্রিকাতে প্রকাশিত তাঁর 'নদীগন্ধ' গল্পটিতেও সেই কথাই এসেছে। গল্পের ঘটনাটি অতি সাম্প্রতিক কালের। মূক বধিরদের ভিড়ে মিশে থাকা প্রাণে জেগে ওঠা মানবিকতাকে কীভাবে দমিয়ে দিয়ে সমাজের একপক্ষ নিজেদের কায়েমি স্বার্থের ঘড়া পূর্ণ করে তারই কথা বলা হয়েছে এখানে। প্রোমোটারের সহায়তায় খেলার জমি বুজিয়ে আকাশ খামচে ধরা বেআইনি বহুতলের বিরুদ্ধে সুর তোলে অনাদি সামন্ত। তিনি আরও প্রতিবাদ করে সেই বহুতলে একটি হাবলি মেয়ের ওপর হওয়া যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে। দুটি ঘটনারই প্রতিবাদ করেছে অনাদি। খুব উচ্চকিতভাবে, চড়া গলায় নয়, বরং যেমন তার স্বভাব, সেই ভাবেই স্বর নামিয়ে, অথচ নিজের সিদ্ধান্তে স্থির থেকে—[২২] ফলস্বরূপ সে পায় জীবনের চরম পুরষ্কার— মৃত্যু। গুলি করে তাকে হত্যা করা হয়। আসলে কণ্ঠরোধ করা হয় তার প্রতিবাদের। রিপোর্টিং এর কায়দায় লেখক খুবই অল্প কথায় তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন গল্পে। গল্পের নিরিখে তা খুবই ছোটো হলেও তাতে পরিবেশিত বক্তব্য মোটেই ছোটো নয়। একজন সুশিক্ষিত মানুষের পক্ষে কখনই আইনকে হাতে নিয়ে প্রতিবাদ করা সম্ভব নয়। তাই তাকে আওয়াজ তুলতে হয় কলম ধরতে হয় সামাজিক এই ব্যভিচারের বিরুদ্ধে। কিন্তু তার ফল হিসাবে এই মর্মান্তিক পরিণত কোন ভাবেই কাম্য নয়। তাই লেখকের এই গল্প যেন কোথাও সেই সামাজিক হিংস্রতার প্রতি সাহিত্যিক প্রতিবাদের স্মারক।

শুধু সমাজে শোষিত মানুষের কথাই কিন্নর রায় লেখেননি, তার সাথে লিখেছেন সেই সমাজে বাস করা মানুষের ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধের কথা। সময়ের সাথে সাথে যে মূল্যবোধ মানুষের মধ্য থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে। 'অমিত গায়েনের মেট্রোকল্প' (শারদীয় কথাসাহিত্য, ১৪২১) গল্পে লেখক সেই কথাই বলেছেন—

অমিত গায়েন তেষট্টি প্লাস। তার দুই মেয়ে রিনা ও টিনা— নিজেরা নিজেদের পাত্র নির্বাচন করে বিয়ে করেছে। ছেলে শমিত চাকরি করে ব্যঙ্গালুরুতে। অমিতের স্ত্রী লাবণ্য তার কাছেই থাকে। তাই রিটায়ার্ড ব্যাঙ্ক অফিসার অমিত ও স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মিস্ট্রেস লাবণ্যের যৌন মিলনের এক পর্যায়ক্রমিক বিরতি এখন। নিজের ক্রমাগত বর্ধিষ্ণু বয়সের ওপর যৌবনের ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে অমিত তাই— চুলে কালার করে, বাসের সিনিয়র সিটিজেনের সিটে না বসে জেনারেলে বসে— এ যেন তার নিজের শরীরের কাছে তার নিজেরই ছলনা। বয়সকে হার মানাবার অদম্য প্রচেষ্টা।

অমিত আজ মেট্রো চেপে চলেছে শোভাবাজারের শমিতা দত্তের বাড়ি। যে তার প্রয়াত ব্যঙ্ক কলিগ ধিরাজের স্ত্রী। অমিতের থেকে ছয়-সাত বছরের ছোটো শমিতাও এখন বড়োই একা। কেননা তার একমাত্র মেয়ে থাকে স্বামীর সাথে মুম্বাইয়ে। এই একাকীত্ব তার জীবনের নিঃসঙ্গতার শুধু নয়, শারীরিক নিঃসঙ্গতাও জড়িয়ে আছে তার সাথে। তাই নিজের যোগব্যায়াম করা, হরমোন থেরাপি করা শমিতা অমিতের সামনে নিজেকে মেলে ধরে যৌবনের হারিয়ে যাওয়া সময়কে ফিরে পেতে। আর নিজের অভুক্ত শরীরী আবেদনের পূর্ণতা খুঁজতে অমিত জড়িয়ে ধরে শমিতাকে। কিন্তু শমিতার বস্ত্র উন্মোচন করতেই চমকে ওঠে অমিত,... ফণাশূন্যরা হিলহিলিয়ে হাঁটছে বুকের ওপর। আর বুক জুড়ে পড়ে আছে খানিকটা যেন শুকিয়ে যাওয়া শিথিল, লোমচর্ম স্তনময়।... শমিতার এই চেহারা দেখে খানিকটা ভয়ে কিছুটা ঘেন্নায় একটু দূরে সরে যেতে চাইল অমিত গায়েন। শমিতা ততক্ষণে তার সাপ মোড়ান দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে অমিতকে।[২৩] এখানেই গল্পের শেষ হলেও লেখক যেন কোথাও বলতে চেয়েছেন কাম প্রবিত্তির পিছনে ছুটতে ছুটতে মানুষ নিজেকেই হারিয়ে ফেলছে কোথাও। আর হারিয়ে ফেলছ তার মানবিক মূল্যকে। সেই দিকগুলোর প্রতিই লেখক নজর আকর্ষণ করতে চেয়েছেন পাঠককে।

ষাট-সত্তরের দশক থেকে বাংলা ছোটোগল্প, উপন্যাসের চেহারা বদলাতে থাকে দ্রুত গতিতে। প্রচলিত সংজ্ঞার বাইরে এসে শাস্ত্রবিরোধী গল্প লেখার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যেতে থাকে গল্পকারদের মধ্যে— দেবেশ রায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, সন্দীপণ চট্টোপাধ্যায়, আবুল বাশার, নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের লেখায় সেই নতুন রীতির প্রয়োগ এসেছে। কিন্নর রায়ের ক্ষেত্রেও তা এসেছে স্বাভাবিক ছন্দেই। তাঁর বিভিন্ন গল্পের বুননে গড়পড়তা গল্প রীতি না এলেও এসেছে গভীর জীবনবোধ যা অভিজ্ঞ বোদ্ধার মতনই তিনি বলে গেছেন

সৃষ্ট বিভিন্ন গল্প চরিত্রের মধ্য দিয়ে। যেমন- পথিক নামক একটি ড্রাগ আক্রান্ত চরিত্রের মধ্যদিয়ে তিনি গল্পের সাধারণ রীতি থেকে সরে এসে সমগ্র নেশাগ্রস্ত মানুষের মানসিক অবস্থা তথা তার ক্রমপরিণতির কথা বলেছেন 'মায়াদর্পণ' (প্রতিক্ষণ, ১৯৮৭) গল্পে। এছাড়া আছে কাজের সূত্রে বাংলাদেশী মানুষের ইন্ডিয়ান হয়ে যাবার সংঘর্ষ, মানবিক অবসাদ ও তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা দালালচক্রের বিবরণ নিয়ে লেখা গল্প 'আবু যে ভাবে ইনডিয়ান হয়ে গেল' (শারদীয় পরিচয়, ২০১৪)।

প্রচলিত রীতির বাইরে লেখা গল্পের মতনই কিন্নর রায় দেখিয়েছেন ভারতীয় আখ্যানের প্রতি গভীর আগ্রহ, ভারতীয় আখ্যান রীতির যে চিরাচরিত কথন ভঙ্গি, তা এই ২০১০-এ এসেও আমার কাছে গ্রহণযোগ্য। তাই বৌদ্ধজাতক কাহিনি, কথাসরিৎসাগর, বেতাল পঞ্চবিংশতি, বত্রিশ পুতুলের উপাখ্যান, পঞ্চতন্ত্র আর সবার ওপরে মহাভারত আমাকে লিখতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে আছে রামায়ণ। এই সব মহাগ্রন্থের কাছে আমার ঋণের শেষ নেই।[২৪] সেই মতোই তাঁর বিভিন্ন গল্পে এসেছে এই আখ্যান ধারার প্রয়োগ। যেমন— 'ধম্ম' (শিলাদিত্য উৎসব সংখ্যা, ১৪১৯) গল্পে বুদ্ধদেবের স্ত্রী যশোধরা ও বুদ্ধদেবকে পরমান্ন প্রদানকারী সুজাতার কথোপকথন, রাজা বিক্রমাদিত্য ও বেতালকে নিয়ে লেখা বেতালের অষ্টবিংশতম কাহিনি (নবান্ন, ১৪১৯), মৎস্যাবতারের কথা এসেছে 'সামুদ্রিক' (প্রতিক্ষণ, ১৯৯৫) গল্পে, রামায়ণের কথা এসেছে 'বঙ্গলিপি'-তে (দিবারাত্রির কাব্য, ১৯৯৮)। নানান গল্পে ছড়িয়ে আছে তাঁর পৌরাণিক অনুষঙ্গের নানান উপাদান।

আবার এই সকল উপাদানের এক বিবর্তিত যাদুমাত্রিক প্রয়োগ লক্ষ্যকরা যায় তাঁর কিছু গল্পতে। রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ, জীবনানন্দের মতন মনীষীরা একদিন ছিলেন এই জগতে আজ তাঁরা অতীত। তবুও তাঁদের স্মৃতি থেকে গেছে আপামর বাঙালির মধ্যে। সেই আবেগকে কাজে লাগিয়ে কিন্নর রায় তাঁর কল্পবৃক্ষের শাখায় তাঁদের করে তুলেছেন জীবন্ত। লেখকের কথায়, আমি শুধু কথক হবার চেষ্টা করেছি মাত্র। কল্পনা, ইতিহাস, খণ্ডসময়, মহাসময়— সব কিছুকে একসঙ্গে ঘেঁটে, তালগোল পাকিয়ে দিয়ে হয়ে উঠতে চেয়েছি নির্জন এক কথোয়াল।[২৫] তাই তো কাদম্বরী দেবীর স্মৃতিকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের নিভৃত যাপনের কথা এসেছে 'ছায়ালোকেশ্বরী' (আজকাল রবিবাসর, ২০১০), 'ছায়া অন্ধকার' (বৈশাখী, ১৪১৭) গল্পে। আবার জীবনানন্দ, বিভূতিভুষণকে জীবন্ত করে তুলেছেন 'মায়াযান' (অনুষ্টুপ, ১৪০৫) গল্পে। যারা তাঁর চিত্রকল্পে

শুধু জীবন্তই নয় হয়ে উঠেছে পাঠকের ইতিহাস যাত্রার ভগীরথ স্বরূপ। তিনি শুধু ইতিহাসের মানুষকেই জীবন্ত করে থেমে থাকেননি, জীবন্ত করেছেন তাঁদের সৃষ্ট চরিত্রকেও। নিজের মানসলোকের যাদুময়তায় তারা পেয়েছে এক আধুনিক রূপ। ২০১৬-তে প্রকাশিত 'গোবিন্দলাল@রোহিণী ডট কম' তারই শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। গল্পে দেখা যায়, নিজের স্ত্রী ভ্রমরকে ভুলে গোবিন্দলাল রোহিণীর যৌবনরসে নিজেকে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত করে দিয়েছে। কিন্তু রোহিণীর মন গোবিন্দলালে আকৃষ্ট নয়। সে নিজের জন্য গচ্ছিত স্বর্ণের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করতেই বেশি আসক্ত। তাই রোহিণী বলেছে, যত বলি, ওগো দাও- দাও একজোড়া সোনার নূপুর গড়িয়ে, তা বামুনের ব্যাটা, নাকি কায়েতের পো— সেসব শুনলে তো! মহা কেপ্পন, হাড় কৃপণ যাকে বলে— একেবারে বখিল।[২৬] গল্পের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ঘটনা হল রোহিণীর সাথে বঙ্কিম চাটুজ্জের ফেসবুক ও স্কাইপে চ্যাটিং।

আর এই চ্যাটিং-এর সুত্র ধরেই আগমন ঘটেছে ভ্রমর তথা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা। যেখানে বিদ্যাসাগরের নারী উদ্ধারের সংঘর্ষের প্রচেষ্টার কথা এলেও ভ্রমরের সাথে রোহিণীর চ্যাটিং-এ এসেছে নারী হৃদয়ের ঈর্ষা পরায়ণতা, ভ্রমরের সঙ্গে স্কাইপে কথা বলার সময় রোহিণী রীতিমতো উদলা করে দেয় নিজের যুগল সম্পদ।... দ্যাখ, দ্যাখ আর দ্যাখ। দেখতে দেখতে জ্বল। জ্বলতে জ্বলতে মর। ভাবিয়া দ্যাখ, কেন, কোন কারণে তোদের মিনসেরা আমাদের পরে এসে গড়াগড়ি খায়। যা বলি তাই করে।[২৭] মদ্যপ অবস্থায় মদ্যপানের টেবিলে গোবিন্দলাল যখন জানতে পারে রোহিণীর সাথে বঙ্কিমচন্দ্রের ফষ্টিনষ্টির কথা, তখন নিজের রাঁড়ের শাস্তি বিধান স্বরূপ উপন্যাসের মতো গুলি করে রোহিণীকে, কিন্তু চিরতরে মরিল না। চালু বাংলা সিরিয়ালের অনুকরণে পুনরায় বাঁচিয়া উঠিল। মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরে। ফলে গুলির শব্দে পুলিশ আসিলেও শেষ পর্যন্ত আটক গোবিন্দলাল মুক্তি পাইল। ঘোষিত হইল ধর্মের জয় অধর্মের পরাজয়।[২৮]

আসলে লেখক তাঁর এই রিমেকে ধর্ম অধর্মের সূক্ষ্ম সীমাটাকে ভেঙে দিতে চেয়েছেন। বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসে যে ধর্মের জয়ের কথা বলেছেন আজকের বর্তমান সমাজে প্রায়শই অলক্ষ্যণীয়। সেখানে থাকে না কোন ধর্ম, থাকে তো কেবল নিজ স্বার্থ পূরণের দুরভিসন্ধি। তাই গোবিন্দলাল, রোহিণীর মতো চরিত্ররা কিন্নর রায়ের হাতে জীবন্ত হলেও আধুনিকতার রূপ নিয়ে তা পাঠকের দরবারে এসে উপস্থিত হয়েছে।

সাংবাদিকতার প্রবণতা নিয়ে কিন্নর রায় প্রথমে লিখতে শুরু করলেও পরবর্তী কালে তাঁর লেখাতে এসেছে অভিজ্ঞতার বিপুল সম্ভার। যেখানে গ্রাম-শহরের বিভাজন নেই, নেই কোন জাত-ধর্মের বৈষম্য— আছে তো কেবল গভীর জীবনবোধ, ইতিহাসবোধ, কল্পনা ও দার্শনিক অন্তরদৃষ্টি। যা তাঁর গল্পের ভাষা, প্লট, উপমা ব্যবহার ও আখ্যানের গতিময়তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। তাঁর কথায়, আগে যেটা হত, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাটা খুব বেশি থাকত। যত বয়স গড়ায় তখন স্বপ্ন-বাস্তব-কল্পনা মিশতে থাকে আমার লেখায়।[২৯] সব মিলিয়ে একথা বলতে হয় তাঁর লেখালেখি সেই সমাজেরই মুখশ্রী, যেখানে নেই কোনো কৃত্রিমতা, নেই শ্রেণিবিদ্বেষের দড়ি টানাটানি। আছে তো কেবল নির্মম, নিরাবরণ রুক্ষ বাস্তব।

টীকা

১. কিন্নর রায়, 'আমার লেখালেখি- 'নেহাতই গলির পেছনে ব্যাক খেলা' অথবা জনৈক 'পাগলা দাশু'র কিছু ফেলাছড়া কথা', পূর্ব (২০১২), পৃষ্ঠা ১৬৯
২. কিন্নর রায়, ফায়ারিং স্কোয়াডের পাঁচিলে প্রজাপতি, 'সেরা ৫০টি গল্প', দে'জ (২০১১), পৃষ্ঠা ১৯-২০
৩. কিন্নর রায়, 'সেরা ৫০টি গল্প', দে'জ (২০১৯), পৃষ্ঠা ৫৪৭
৪. ঐ পৃষ্ঠা ৫৪৮
৫. কিন্নর রায়, গল্পসল্প, দে'জ (২০১৯), পৃষ্ঠা ২৮২
৬. ঐ পৃষ্ঠা ২৮৫
৭. কিন্নর রায়, ফায়ারিং স্কোয়াডের পাঁচিলে প্রজাপতি, 'সেরা ৫০টি গল্প', দে'জ (২০১১), পৃষ্ঠা ১৬
৮. কিন্নর রায়, রথযাত্রা, প্রমা (১৯৯৫), পৃষ্ঠা ২৫
৯. কিন্নর রায়, রথযাত্রা, প্রমা (১৯৯৫), পৃষ্ঠা ৩২
১০. ঐ পৃষ্ঠা ৩১
১১. কিন্নর রায়, 'প্রকৃতি পাঠের আগের পাঠ', নীললোহিত (২০০৪), পৃষ্ঠা ৩৭১
১২. কিন্নর রায়, 'সেরা ৫০টি গল্প', দে'জ (২০১১), পৃষ্ঠা ২৭২
১৩. ঐ পৃষ্ঠা ২৯২
১৪. ঐ পৃষ্ঠা ২৯২
১৫. কিন্নর রায়, 'সেরা ৫০টি গল্প', দে'জ (২০১১), পৃষ্ঠা ৩৮৫
১৬. ঐ পৃষ্ঠা ৩৮৮
১৭. ঐ পৃষ্ঠা ৩৯১

১৮. কিন্নর রায়, 'আমার লেখালেখি- 'নেহাতই গলির পেছনে ব্যাক খেলা' অথবা জনৈক 'পাগলা দাশু'র কিছু ফেলাছড়া কথা', পূর্ব (২০১২), পৃষ্ঠা ১৭১
১৯. কিন্নর রায়, 'শ্রেষ্ঠগল্প', দে'জ, ২০১১, পৃষ্ঠা ৩১৪
২০. কিন্নর রায়, 'সেরা ৫০টি গল্প', দে'জ (২০১১), পৃষ্ঠা ২৪১
২১. কিন্নর রায়, 'শ্রেষ্ঠগল্প', দে'জ, ২০১১, পৃষ্ঠা ২০৩
২২. কিন্নর রায়, গল্পসল্প, দে'জ (২০১৯), পৃষ্ঠা ১৩
২৩. ঐ পৃষ্ঠা ১১৯
২৪. কিন্নর রায়, ফায়ারিং স্কোয়াডের পাঁচিলে প্রজাপতি, 'সেরা ৫০টি গল্প', দে'জ (২০১১), পৃষ্ঠা ১৭
২৫. কিন্নর রায়, 'পদ্ম পাতায় রোদের শিশিরসম', 'শ্রেষ্ঠগল্প', দে'জ, ২০১১, পৃষ্ঠা ১৪
২৬. কিন্নর রায়, গল্পসল্প, দে'জ (২০১৯), পৃষ্ঠা ২১৫
২৭. কিন্নর রায়, গল্পসল্প, দে'জ (২০১৯), পৃষ্ঠা ২২০
২৮. ঐ, পৃষ্ঠা ২২৬
২৯. http://galpersay.com/2017

গ্রন্থপঞ্জী

১. কিন্নর রায়, গল্পসল্প, ১ ম সং, কলকাতা, দে'জ (২০১৯)
২. কিন্নর রায়, রথযাত্রা, ২ য় সং, কলকাতা, প্রমা (১৯৯৫)
৩. কিন্নর রায়, 'শ্রেষ্ঠগল্প', ২ য় পরিমার্জিত সং, কলকাতা, দে'জ (২০১১)
৪. কিন্নর রায়, 'সেরা ৫০টি গল্প', ১ ম প্রকাশ, কলকাতা, দে'জ (২০১১)
৫. পূর্ব, ২ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০১২ পৃষ্ঠা ১৬৯-১৮৭
৬. নীললোহিত, দ্বাদশ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০৪, পৃষ্ঠা ৩৫৯-৩৭৩
৭. http://galpersay.com/2017